ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1570-1581
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

যশোরের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প: একটি পর্যালোচনা

ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান, *সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 24.07.2025; Accepted: 26.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Folk arts is an integral part of Bangladeshi cultural history. Traditional arts and crafts evolve over time through the age-old folk practices. Folk art uses traditional motifs reflecting the land and its people. It generally includes those articles that are traditionally made by communities of people to satisfy their religious, social and aesthetic needs. The folk art of Jessore reflects the lifestyle, beliefs and traditions of its rural communities. It also focuses the expression of rural women, their hopes and fears, their desires and aspirations. Jessore is a historically and culturally significant area and it is one of the largest districts of the south-western region of Bangladesh. As a source of Bengal's socio-economic, religious, cultural history *patachitra, pirichitra, kulachitra, alpana, nakshi kantha, nakshi pakha, nakshi shika,* bamboo and cane crafts, *shola,* pottery, *terracotta* etc. the folklore of Jessore is very important. The folk art of Jessore has distinctive characteristics than that of other regions. But now this traditional aesthetic excellence is going to be deleted somewhat with the flow of modern way of life and expansion of urbanization, industrialization, improvement of technology and develop of communication. In order to save the traditional rural cultural heritage of this country, it is necessary to revitalize them. The present paper attempts to examine the characteristics and progress of traditional folk art of Jessore.

Keywords: Jessore, Folk art, Tradition, *Alpana,* Crafts

কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত শক্তির মূল অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে তার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পে। লোকশিল্প হলো লোকসংকৃতির প্রেক্ষাপটে তৈরি সাধারণ মানুষের সৃজনশীল দৃশ্যমান কর্ম যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এটিকে লোকসমাজের অভিব্যক্তি বলা যায়, যে অভিব্যাক্তির মধ্যে তার মানসিক চেতনা, অনুভূতি ও দর্শনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজে বিদ্যমান ধর্মবিশ্বাস, রীতি-নীতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতিকে ধারণ করে লোকশিল্প গড়ে উঠে। মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, মননশীলতা ও ধ্যান-দর্শন লোকশিল্প বহন করে চলে। যশোরের লোকশিল্পও সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর চিন্তন, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ঐতিহ্যিক চরিত্রের পরিচায়ক। ঐতিহ্যই হলো লোকশিল্পের প্রাণশক্তি। যশোরের লোকশিল্প যশোরের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মনন, জীবন প্রণালী, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বৃহৎ জেলা যশোর। বাংলার আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও গ্রামীণ ঐতিহ্যের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে এ অঞ্চলে বিদ্যমান পটচিত্র, পিঁড়িচিত্র, কুলাচিত্র, আল্পনা, নকশি কাঁথা, নকশি পাখা, নকশি শিকা, বাঁশ-বেতশিল্প, শোলাশিল্প, মৃৎশিল্প, মাটির ফলক, শঙ্খশিল্প প্রভৃতি লোকশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যশোরের লোকশিল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে যশোরের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও অগ্রগতি পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

যশোর পরিচিতি:

যশোরের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সে-গৌরব যশোরের কৃতি সন্তানদের জন্য যতটা, ততোধিক এ অঞ্চলের মৃত্তিকালগ্ন মানুষের জীবনচর্যার পরতে পরতে লোকশিল্পের যে উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে, তার জন্য। ভূমির সৃষ্টি ও পত্তনের ইতিহাস নিয়ে ভূ-তত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সকলেই একমত। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের বৈচিত্র্য বিবেচনা করে বাংলাদেশের উৎপত্তিকালকে কেউ টারশিয়ারি যুগ, কেউবা প্লাউসিন যুগ বলে উল্লেখ করেছেন।[১] আবার কেউ কেউ মনে করেন, দশ লক্ষ বছর আগে হিমালয়ের শেষ উত্থানের সময় বাংলার অন্যান্য ভূখণ্ডের ন্যায় যশোর ভূখণ্ডও গঠিত হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপবঙ্গ প্রসঙ্গে যশোরের উল্লেখ থেকে, 'উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুক্তাঃ'।[২]

প্রাচীনকালে বাংলা বিভিন্ন জনপদ ও প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিলো। মুসলিম শাসনামলেও বাংলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক একক গড়ে উঠে। এককসমূহ ইকলীম, খিত্তা, আরসাহ, ইকতা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতো। ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্বের এসব উদাহরণ থেকে প্রদেশ জেলা ও থানার সৃষ্টি হয়। যশোর বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। বাংলার প্রথমদিকে সৃষ্ট জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। ১৭৮৬ সনে এ জেলার সৃষ্টি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলার মধ্যে যশোর জেলার অবস্থান অন্যান্য প্রধান জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশেষ পরিবেশে যশোরের গ্রামীণ জীবন গড়ে উঠলেও অনেক সময় আঞ্চলিক ও লোকজ বৈশিষ্ট্যের কারণে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি হয়। সে পার্থক্য সংস্কৃতিগত ও শ্রেণীগত দিক থেকে জীবিকা নির্বাহপ্রসূত। অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণী থেকে বংশগত বা বৃত্তিভিত্তিক কিংবা জাতি, বর্ণ ভেদ ব্যবস্থার কারণে পৃথক হয়ে পড়ে। যেমন-একাদিকে যে- মৃত্তিকা কুমারের হাতে নিত্যাদিনের ব্যবহার্য বস্তুর উপাদান হিসেবে গণ্য হয়, অপরদিকে সেই মৃত্তিকাই অন্য হাতে কারুকার্যখঁচিত দৃষ্টিনন্দন সামগ্রী হয়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকে সূত্রধর, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যকার, স্বর্ণকার, চিত্রকর ও মালাকার নিজস্ব বৃত্তিতে নিয়োজিত থকে বংশপরম্পরায় সমাজের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। অনুরূপভাবে যশোরের লোকজ, চারু ও কারুশিল্পীরাও নিজেদের অবস্থান থেকে সমাজের চাহিদা পূরণ করে চলছে।

উৎস পর্যালোচনা:

লোকশিল্পের মাঝে জড়িয়ে থাকে জাতির প্রাণসত্তা ও মূল্যবোধ। তাই লোকশিল্প নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলার লোকশিল্প ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন- Ajit Commar, Mookerjee রচিত *Folk Art of Bengal* (Calcutta, 1939); আশুতোষ ভট্টাচার্য এর *বাংলার লোকসাহিত্য* (কলকাতা, ১৯৭২); মাযহারুল ইসলাম রচিত *ফোকলোর পরিচিত এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন* (ঢাকা, ১৯৭৪); Niaz Zaman এর *The Art of Kantha Embroidery* (Dacca, 1981); Sankar Prosad Ghosh KZ©„K iwPZ *Terracottas of Bengal* (Delhi, 1986); তাপস রায় এর 'নকশি কাঁথায় পাশ্চত্য বিষয়' *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৬, (কলকাতা, ১৯৯১); সৈয়দ মাহমুদুল হক এর 'গ্রামীণ চারু ও কারুকলা,' *বাংলাদেশের ইতিহাস* ৩য় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৯৩); শফিকুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প* (ঢাকা-২০১৪); শামসুজ্জামান খান এর *বাংলাদেশের লোকজসংস্কৃতি: যশোর* (ঢাকা-২০১৪); হোসেন উদ্দিন হোসেন সম্পাদিত *বাংলার সংস্কৃতি ও লোকজীবন* (ঢাকা, ২০২৪) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে লোকশিল্প ও লোক সাহিত্য সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে যশোরের উপর তেমন কোন আলোচনা স্থান পায়নি। *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি: যশোর* নামক গ্রন্থে যশোরের লোকশিল্পের সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। এছাড়াও লোকসাহিত্যের বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত যশোরের উপর বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে লোকশিল্প ও কিছু প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং যশোরের লোকশিল্পের উপর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গবেষণা কর্ম নেই। ফলে এ গবেষণা প্রবন্ধে যশোরের লোকশিল্প সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের লোকশিল্প সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যতে গবেষকদের এ বিষয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করবে। তাছাড়া স্থানীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকসাহিত্য বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা এবং যশোরে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

যশোরের লোকশিল্প:

সাধারণভাবে লোক (Folk) বা লোকায়ত কথাটি সমাজের অনগ্রসর, অধঃস্তন বা গ্রামীণ জনমানুষকে বুঝানো হয়। বর্তমানে লোকসংশ্লিষ্ট বিদ্যাশৃঙ্খলার উদ্ভব ও পঠন-পাঠনের ফলে লোক এর অর্থ ও সংজ্ঞা ব্যাপকতা পেয়েছে। লোক হলো- সমঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ যে কোন গোষ্ঠী- হতে পারে তা জাতিগোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, শহর গোষ্ঠী, গ্রাম গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, পেশাজীবী

বা অন্য যে কোন গোষ্ঠী। আধুনিক 'লোক' এর সংজ্ঞানুসারে প্রতিটি গোষ্ঠীই এক একটি লোকগোষ্ঠী।[৩] আবার সকলে মিলে একটি বৃহত্তর লোক এর অন্তর্গত যা বাঙালি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিশিষ্ট লোকবিদ মযহারুল ইসলাম (১৯২৯-২০০৩) এর ভাষায়, লোক কোন নির্দিষ্ট স্তরের মানুষ নয়-সমাজের যে কোন স্তরে লোক বাস করতে পারে-লোক বিশেষ কোন স্থানের অধিবাসীও নয়, শহরে, নগরে বা গ্রামে সে থাকতে পারে। তবে যে স্তরে বা যে স্থানেই সে বাস করুক, লোক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে তার সৃষ্টি কর্ম সে সম্পাদন করে, সেই ঐতিহ্যের আলোকে নতুন ঐতিহ্য সে সৃজন করে এবং তার সৃষ্টি সমাজের সামগ্রীতে পরিণত হয়, বিশেষ করে যে সমাজ মূলত ঐতিহ্য- নির্ভর।[৪] লোক আচরিত শিল্পই হলো লোকশিল্প। সুতরাং লোকশিল্প হলো লোকসমাজের অভিব্যক্তি, যে অভিব্যাক্তির মধ্যে তার মানসিক চেতনা, অনুভূতি ও চিন্তার প্রতিফলন প্রকাশ পায়। যশোরের লোকশিল্প যশোরের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও জীবন সম্পর্কিত চেতনার সমন্বয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। যশোর লোকশিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল হওয়ায় দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এখানের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে পটচিত্র, পিঁড়িচিত্র, কুলাচিত্র, আলপনা, নকশি কাঁথা, নকশি পাখা, নকশি শিকা, বাঁশ-বেতশিল্প, শোলাশিল্প, মৃৎশিল্প, মাটির ফলক, দারুশিল্প প্রভৃতি শিল্প প্রচলিত রয়েছে।

লোকজ চারু ও কারুশিল্পঃ

ক) পটচিত্রঃ

যশোরের গ্রামীণ অঞ্চলে পটচিত্র বিনোদনের এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এ শিল্পেই বাঙ্গালির শিল্পপ্রীতির পরিচয় নিহিত। তাই আজও নর-নারীর সৌন্দর্যের তুলনায় বলা হয় 'পটের মতো সুন্দর' আর দেব-দেবীর প্রতিমাকে বলা হয় 'পটের ঠাকুর।'[৫] পটে অংকিত ছবি হতে পারে পৌরাণিক কিংবা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাধারন জীবনযাত্রা ও আচার অনুষ্ঠানের ছবি। পট্ট বা কাপড় শব্দ হতে পট শব্দের উৎপত্তি। পটচিত্র অংকণকারীরা পটুয়া হিসেবে পরিচিত। আবার এদেরকে গণশিল্পী হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।[৬] পটুয়ারা সুতী কাপড়েরর উপর প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর রং দ্বারা নানা ধরণের চিত্র অংকন করেন। এ শিল্প ষোল শতরের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিকাশ লাভ করে। এ সময় থেকে কৃষ্ণ লীলা, রামায়ণ ও মনসা মঙ্গলের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে পট অংকন শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে যম রাজের শাস্তি সম্পর্কিত চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও গাজীর পটচিত্রের প্রচলন রয়েছে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর অনুকরুণে গাজীর কাহিনী অংকন করা হয়। গাজীর পটে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তা হলো- গাজীর মহাত্ম ও গুণকীর্তন, সামাজিক হিতোপদেশ ও যম রাজের শাস্তি।[৭] পটুয়াদের সাথে আধুনিক শিল্পীর পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক চিত্রকর্মে শিক্ষার ছাপ থাকে, লোকশিল্পে তা থাকে না। কারণ অধিকাংশ লোকশিল্পীই অশিক্ষিত। তবে তারা সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রাকে ধারণ করে বলে তাদের চিত্রকর্ম সমগ্র গ্রামীণ সমাজের হয়ে ওঠে। বস্তুত: হিন্দু ও মুসলিম সমাজে এক সময়ে পটচিত্র শিল্পের যে কদর ছিল বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে তা অনেকটাই খ্রিয়মান হয়ে পড়েছে।

চিত্র ১: গাজীর পট

খ) নকশি কাঁথাঃ

যশোর অঞ্চলের নকশি কাঁথার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। গ্রামীণ নারীদের জীবনের প্রয়োজনে তাদের দক্ষতা ও সুপ্ত প্রতিভার বহি:প্রকাশ হিসেবে নকশি কাঁথার উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নকশি কাঁথার প্রচলন থাকলেও যশোর অঞ্চলের কাঁথা বিশেষ বৈচিত্রের কারণে বিশিষ্টতার দাবিদার। এই কাঁথায় স্থানীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে বলে এটির স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা রয়েছে। কাঁথা শব্দটি সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দ থেকে এসেছে।[৮] পুরাতন কাপড় সেলাই করে প্রথমে কাঁথার জমিন তৈরী করা হয়। অতঃপর সূঁচ-সূতার সাহায্যে তৈরি করা হয় বাহারী নকশা। এই বাহারী নকশার কারণেই কাথাঁগুলি পরিচিতি পেয়েছে নকশি কাঁথা নামে। নকশা ফুঁটিয়ে তোলার জন্য কাঁথায় নানা রঙের সুতা ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে নকশি কাঁথা আবার বিভিন্ন নামের ও আকৃতির হয়ে থাকে। কাঁথায় ব্যবহৃত মটিফের মধ্যে পদ্ম, চন্দ্র, সূর্য, চাকা, সয়াস্তিকা, জীবনবৃক্ষ, কালকা, পানি, পাহাড়, মাছ, নৌকা, পদচিহ্ন, রথ, কৃষি সরঞ্জাম, পালকি, ফুল ও পানপাতা, ময়ুর ও হাঁস ইতাদি। যশোরের কাঁথা আকারে ছোট ও

বর্গাকার, মাঝখানে ফুল এবং অধিকাংশ জায়গায় লতাপাতা দ্বারা আবৃত। যশোরের নকশি কাঁথায় বিদেশী, মটিফও লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকে নির্মিত যশোরের একটি সৃজণী কাঁথায় অন্যান্য লোকায়ত বিষয়ের সাথে অশ্বারোহী ইউরোপীয় সেনাদের দেখানো হয়েছে।[৯] সেলাইয়ের ধারা অনুসারে নকশি কাঁথা যশোর ও রাজশাহী এ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যশোর রীতিতে চিত্রিত কাঁথা, মটিফ কাঁথা এবং পাহাড় কাঁথা- এ তিনটি কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, যা রাজশাহী রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১০]

পূর্বে গ্রামের নারীরা এককভাবে বা যৌথভাবে কাঁথা সেলাই করতেন। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁথা তৈরী হয়। যশোরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এনজিও সংস্থা ব্রাকের আওতায় এ ধরনের নকশি কাঁথার বুনন পরিচালিত হয়। ব্রাক ছাড়াও যশোর সদরের 'যশোর স্ট্রিট', নকশি কাজের জন্য প্রসিদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রেতারা এখান থেকে নকশি কাঁথা সংগ্রহ করে থাকে।[১১] সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে গবেষণা অঞ্চল হিসেবে যশোরে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন রীতিতে নকশি কাঁথা শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল যা আজও লোকজ শিল্পের অনন্য প্রতীক হিসেবে বিদ্যামান রয়েছে।

চিত্র ২: নকশি কাঁথা

গ) শোওয়া কাঁথা:

শোয়ার উপকরণ হিসেবে এ ধরনের নকশি কাঁথা ব্যবহৃত হয়। দু'ভাবে এ কাঁথা তৈরি করা হয়। বিছানোর জন্য ব্যবহৃত কাঁথার জমিন প্রস্তুতের সময় ভেতরের আস্তরণে পুরু কাপড় ব্যবহার করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এ শ্রেণির কাঁথার ক্ষেত্রে মাবন ও পাশের নকশির বিষয়টা গুরুত্ব সহকারের বিবেচনা করা হয়। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো নকশির বুনন হয় অত্যন্ত ঘন। ফলে কাঁথা অত্যন্ত মজবুত হয়। অপরদিকে গায়ের কাঁথা জমিন প্রস্তুতের সময় অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড় ব্যবহার করা হয়। এ কাঁথায় বুননের ঘনত্ব অপক্ষো নকশায় নান্দনিকতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।[১২] গ্রামীণ লোকজ উপকরণ ফুল, লতাপাতা, পশু-পাখি ইত্যাদি নকশা এ শ্রেণির কাঁথায় অধিক লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ৩: শোওয়া কাঁথা

ঘ) ছাপা কাঁথা:

শোওয়ার কাঁথা ও গায়ের কাঁথা ছাড়াও বর্তমানে যশোরে বাণিজ্যিকভাবে অধিক হারে ছাপা কাঁথা তৈরি হচ্ছে। এনজিও এবং কুটির শিল্পে ক্রেতার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারিগররা এ নকশি কাঁথার উপর গুরুত্ব প্রদান করছে।[১৩] ছাপা কাঁথার ক্ষেত্রে জমিনের ভেতরে কাপড় ব্যবহৃত হলেও এর উপরি অংশে সাদা বা লাল সালুর নতুন অব্যবহৃত কাপড় ব্যবহার করা হয়।

ঙ) বালিশ বা পিলো নকশি:

যশোর অঞ্চলে বালিশ বা সোফার পিলো কভারে এক রকম নকশির প্রচলন আছে। এ শ্রেণির নকশির বৈশিষ্ট্য হলো বুননের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড় দ্বারা সেলাই করা হয়। এ ছাড়া এর জমিন তৈরির জন্য পৃথক কোন কাপড়র ব্যবহার করা হয় না, পরিবর্তে উপয় পিঠে এক বা দুই রাঙা কাপড় ব্যবহার করা হয়।[১৪]

চিত্র ৪: সোফার পিলো কভার

চ) ওয়াল ম্যাঁঠ:

সম্প্রতি যশোর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ওয়ালম্যাট তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের বাইরে এর বিস্তর চাহিদা রয়েছে। নতুন কাপড়ের জমিনের নান্দনিক বিভিন্ন চিত্র জীবন্ত করে কারিগররা ওয়াল তৈরি করেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলার চিরচেনা দৃশ্য, নিত্য ব্যহার্য দ্রব্য সামগ্রীর নকশা ইত্যাদি প্রাধান্য পায়।[১৫] একজন সাধারণ কারিগরের তঁতের বুনন ফ্রেমে বন্দি হয়ে শেষ পর্যন্ত ওয়ালম্যাটটি বিত্তবানের রুচি ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ড্রয়িং রুমে শোভা পায়।

চিত্র ৫: নকশি ওয়াল ম্যাট

ছ) আসন নকশি:

মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহে আত্মীয়বর্গের বসার জন্য অথবা পুরোহিত মশাইয়ের পূজা-অর্চনার সময় আসন গ্রহণকে উপলক্ষ করে নির্মিত হয় আসন নকশী। আসন নকশী ছোট আকারের এবং বর্গাকারের হয়। মোটা কাপড় ছাড়াও নকশি তৈরিতে চট ব্যবহৃত হয়। যশোরের মনিরামুপুর, কেশবপুর ও ঝিকরগাছা অঞ্চলের হিন্দু পরিবারে আসন নকশি ঐতিহ্যের পরিচায়ক এবং প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে নকশি আসন ব্যবহার হয়।[১৬]

জ) দস্তর খান:

ডাইনিং টেবিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যশোর অঞ্চলে নকশিযুক্ত দস্তরখানা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। দৈর্ঘ্যে ১০-২০ ফুট বা তার অধিক ও প্রস্তে ২ ফুটের মধ্যে এ নকশি কাপড়ের উপর খাওয়ার প্লেট রাখা হয়। যশোর শহরে মর্ডান ডেকোরেটরের কাছে একাধিক নকশিমুক্ত দস্তরখান রয়েছে।[১৭] ভাড়ার বিনিময়ে ভোজ অনুষ্ঠানের তারা দস্তরখানা সরবরাহ করে থাকে।

ঝ) নকশি জায়নামাজ:

মুসলিমদের নামাজ পড়ার জন্য কাপড়ের জমিনে বিশেষ নকশা করে তৈরি হয় নকশি জায়নামাজ। এ ক্ষেত্রে নকশিতে কাবা শরিফের ছবি ও লতা-পাতা ফুটিয়ে তোলা হয়। কাপড় ছাড়াও জায়নামাজ তৈরির জন্য নকশির জমিনের জন্য ব্যবহৃত হয় চট। এছাড়াও জায়নামাজ তৈরির জন্য খেজুর পাতা বা বেতের তৈরি পাটির উপর নকশার কাজ করা হয়।

ঞ) গিলাপ:

যশোর অঞ্চলে সাধারণত মুসলিম বাড়িতে নকশিযুক্ত গিলাপের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয। কুরআন মজিদ মুড়িয়ে রাখার জন্য কাপড়ের বিশেষ থলি তৈরি করে তার উপর নকশা করা হয়। গিলাপে ব্যবহৃত নকশা প্রধানত লতা-পাতা, জ্যামিতিক রেখাচিত্র ও ফুলের হয়ে থাকে। যশোরের ঘূর্ণী এলাকায় ১৯৮৯ সালে আছিয়া বেগমের নেতৃত্বে 'সংস্কার' নামে একটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক সমিতি গড়ে ওঠে।[১৮] তার নেতৃত্বে মহিলারা নকশিকাঁথা, পটচিত্র, ওয়ালম্যাট এবং আলপনার কাজ করে থাকে। জীবনের

সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা তাদের সূচি শিল্পে প্রকাশ পায়। জীবন আলেখ্য ফুঠে ওঠে তাদের নিপুণ শিল্পগুণে। ফলে যশোরের নকশি দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশিদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

ট) নকশি পাখা:

দীর্ঘ কাল থেকে বাংলার শহর ও গ্রামীণ মানুষ গরম নির্বারণের জন্য হাত পাখা ব্যবহার করে আসছে। হাত পাখার ঐ শীতল বাতাসকে কেন্দ্র করে সংগীতশিল্পী ও কবিরা গান ও কবিতা রচনা করেছেন। হাত পাখাকে কেন্দ্র করে ২০১৬ সালে গীতিকার মোহাম্মদ রফিকুজ্জামন একটি গান রচনা করেন। গানটির সুরকার রাজেশ এবং গায়ক আকবর। কবি হেলাল হাফিজ হাত পাখাকে অবলম্বন করে 'প্রস্থান' নামক কবিতা রচনা করেছেন।[১৯] আকারের দিক থেকে পাখা ছোট, মাঝারি ও বড় হয়ে থাকে। পাখার উপর নানা ধরণের নকশা অংকন করা হয় বলে এ পাখা নকশি পাখা হিসেবে পরিচিত। এ পাখা তৈরিতে বাঁশ, বেত, ফিতা, সুতা, খেজুরপাতা, তালপাতা, শন, কলার শুকনো খোল, পাখির পালক, শোলা, কাপড়, কাশ, গমের ডাটা, মোটা কাগজ, চন্দন কাঠ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[২০]

পাখায় নকশা অংকনে লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা এবং পশু পাখির বিভিন্ন মটিফ ব্যবহার করা হয়। নির্মাণ উপকরণের উপর ভিত্তি করে পাখার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। যেমন-সুতা দ্বারা তৈরিকৃত পাখা শঙ্কলতা, তারা ফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি, বাঁশ দ্বারা তৈরিকৃত পাখা- গুলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, ভালবাসা, হাতি, মানুষ এবং বেতের তৈরি পাখা পালঙ্কপোষ, পাশারদান প্রভৃতি নামে পরিচিত।[২১] এছাড়াও পাখার উপর বিভিন্ন প্রবাদ বাক্য, নীতিকথা ও ছড়া লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত বৈদ্যুতিক পাখা আবিষ্কার হওয়ায় গ্রামীণ পাখার ব্যবহার হ্রাস পেলেও এর আবেদন একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণের ফলে পাখাশিল্পী গ্রাম বাংলার মানুষের শুধু নয়, নাগরিক জীবনেও 'গরমকালের পরম পাখা' হিসেবে যেমন মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি বাণিজ্যিকভাবেও পেয়েছে সফলতা। তবে ব্যবহারিক প্রয়োজনই চারু ও কারু শিল্পের শেষ কথা নয়। লোক-মানব সৃষ্ট এ শিল্পকর্ম নিত্যদিনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটিয়েও শৈল্পিক নান্দনিকতা এবং বহুজনের ভালবাসার স্পর্শে গোটা সমাজেরই প্রতীক হয়ে উঠে।

চিত্র ৬: নকশি পাখা

ঠ) নকশি শিকা:

যশোরে গ্রামীণ নারীদের গৃহকর্মে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে শিকা উল্লেখযোগ্য। শিকা তৈরিতে নকশা ব্যবহার করা হয় বলে এটি নকশি শিকা হিসেবে পরিচিত। শিকা শব্দটি সংস্কৃত 'শিক্য' শব্দ থেকে উৎপন্ন। মহিলারা পাট ও কাপড় দিয়ে শিকা তৈরি করে। আকৃতি ও ব্যবহারের দিক থেকে শিকাগুলি মাছ কাটা, কবুতর খোপী, জালীবেড়ী, উলটা কেশী, আউল কেশী, জিলাপী আজিতি, গুজুরি দোলা, কল পাশা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[২২] শিকা গৃহাভ্যন্তরে ঝুলিয়ে তার মধ্যে মাটির পাত্র, থালা, লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ, আয়না-চিরুনী প্রভৃতি সামগ্রী রাখা হয়। মূলত শিকার ব্যবহার সৌখিন রুচির পরিচায়ক। তবে গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় এর ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ নারীরাও এই ঐতিহ্যবাহী নকশি শিকা তৈরি ও ব্যবহার থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ড) শঙ্খ শিল্প:

সনাতন ধর্মীয় বিধিতে সন্ধ্যায় শাঁখ বা শঙ্খ বাজানো রীতি প্রচলিত। তাছাড়া বিয়ে, পূজা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজানো হয়। এ শঙ্খকে শিল্পী হিসেবে বেছে নিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদেরকে 'শাখারি' বলা হয়। সামুদ্রিক শঙ্খকে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা ব্যবহার উপযোগী করা হয়। শঙ্খকেটে তাতে নানা লতা-পাতা এঁকে শঙ্খের চুড়ি তৈরি করে শঙ্খ শিল্পিরা; যা 'শাঁখা' বলে পরিচিত। এটা বিবাহিত হিন্দু মহিলার ব্যবহার করেন। শাখা ও সিন্দুর বিবাহের পবিত্রার প্রতীক বলে বিবেচিত। শঙ্খ শিল্পিকে ঘিরে যশোরের অভযনগরে শঙ্খ শিল্পি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। নওয়াপাড়া বাজার 'সোনালী শঙ্খ ভাণ্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মালিক হলেন তপন কুমার ধর। এছাড়াও আনন্দ কুমার ধর ও বঙ্কিমচন্দ্র ধর প্রমূখ ব্যক্তি শঙ্খ

শিল্পের সাথে জড়িত।[২৩] শঙ্খ ব্যবহারের সাথে লোক বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট যুগ যুগ ধরে লালিত এ বিশ্বাস হিন্দু পুরাণ তথা মিথ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

ঢ) বাঁশ ও বেত শিল্প:

কারুশিল্পের আরেকটি ধারা বাঁশ ও বেতের কাজ। কারুবৃত্তিজীবি এ শিল্পিরা সামাজিকভাবে খুই বঞ্চিত এবং এ বৃত্তি তাদেও জীবকা নির্বাহের প্রধান উপায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঋষিরা বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে জড়িত। যশোরের নারকেল বাড়িয়া, শেখের হাট ও রামচন্দ্রপুর গ্রামে ঋষি সম্প্রদায় বসবাস করেন। এ অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ ও বেত বাগান রয়েছে। শিল্পিরা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, কুলো, মাথাল, খাঁচা, খালই, খাদুন, পোলো, ঘুণি, চারো, ট্যাপারী ইত্যাদি তৈরি করেন। যশোরের অভয়নগর উপজেলার ভূমি নীচু হওয়ায় এখানের নদী, বিল ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে এখানে বাঁশ শিল্পের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত হয়।[২৪] বেত ও বেতজাত দ্রব্যেও ব্যবহার লোকঐতিহ্যকে লালন করে। বেত দিয়ে ধামা, খুচি, মোড়া, চেয়ার, ঝাপি, সাঁজি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এয়াড়াও লোকবাদ্য যেমন- ঢোল, তবলা, একতারা, দো-তারাসহ বিভিন্ন উপকরণে বেতের ব্যবহার হয়।

চিত্র ৭: বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী।

ণ) শোলাশিল্প:

যশোরের বিল এলাকায় প্রচুর শোলা জন্মে। শোলা দিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদেও খেলনার পুতুল, মুকুট, মালা, চালচিত্র, কমদফুল, টোপর ও নানা ধরনের ফুল তৈরি হয়। তবে ফুল ও টোপর সাধারণত হিন্দুদেও ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়ে থাকে। হিন্দুদেও বর-কনের বিয়ের আসরের মাথার টোপর ও দেব-দেবীর মাথার টোপর ছাড়াও লোকবিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত ধানের গোলা ঘওে টাঙ্গানো ফুল শোলা দিয়ে তৈরি হয়। বাসন্তী পুজায়ও শোলার ফুলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শোলাকে বিভিন্ন আকৃতিতে কেটে নানা রং দিয়ে নান্দনিক শিল্পেকর্ম তৈরি করা হয়। যারা শোলা সামগ্রী তৈরি করেন তারা 'মালাকার'[২৫] হিসেবে পরিচিত। যশোর জেলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে শোলা শিল্পের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৮: শোলা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ফুল।

ত) হোগলার পাটি ও বেদে পাটি:

যশোরের অভয়নগর উপজেলায় নমশূদ্র অধ্যুষিত ছিয়ানব্বই জনপদে 'সাতাশ' বিল রয়েছে। এই বিলে প্রচুর পাটি শিল্পের প্রধান উপকরণ পাত জন্মে। পাটি শিল্পের কারিগররা পুষ্ট ও পক্ব পাত সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাটের আঁশের মতো বেছে নেয়। বাছাইকৃত পাত ও চিকন পাটের সুতার সাহায্যে পাটি তৈরি করে। পাটি বুনোনের সময় পাতের কোন কোন অংশে লাল ও সবুজ রং করে, যা পাটির বিশেষে গুরুত্ব বহন করে। পাতের তৈরি এ পাটিকে হোগলার পাটি বলে।[২৬] বাড়িতে বসা, শোয়া ও ঘুমানোর কাজে এ পাটি ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে সাদারণত যশোরেই এই পাটি পাওয়া যায়। সুতরাং এটা যশোরের লোক সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

হেমন্তে খেজুর গাছ কাটা বা ছাটাই করা হয়। এ সময়ে গ্রামীণ নারীরা খেজুর গাছের পাতা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত পাতা দিয়ে নিজস্ব মেধা ও শ্রম দিয়ে পাটি তৈরি করে, যা যশোর অঞ্চলে গ্রামে 'বেদেপাটি' বলে পরিচিত।[২৭] মুসলিমরা নামাজ ও হিন্দুরা পূজা-অর্চনার জন্য চিকন পাতার ছোট পাটি তৈরি করে। অপর দিকে মোটা পাতার বড় পাটি সাধারণ খোলা উঠানে ধান, গম, মুসুর, শস্য ইত্যাদি ফসল রোদে শুকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

থ) পাখির বাসা:

যশোর সদর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জমিপাড়া, বাহদুরপুর। এখনে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় কুটির শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে পাখির বাসা।[২৮] এছাড়াও রয়েছে ফুলদানি, তাক, চাঙারী প্রভৃতি। হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাধারণ মানুষ তাদের শৈল্পিকে দক্ষতার কারণে এখানে অনেকের কাছ হয়ে উঠেছেন অসাধারণ। তাদের তৈরিকৃত পাখির বাসা একদিকে যেমন ঘরের শোভাবর্ধক, অপরদিকে পাখির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এটি পরিবেশ রক্ষারও উপায়। দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবল থেকে পাখিদের রক্ষার জন্য এটি অনেকটাই স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত। বাসার নির্মাণ প্রক্রিয়া সরল প্রকৃতির। অনেকটাই গরুর ঠুসির আদলে তৈরি করা হয়। ফলে পাখিদের নিরাপদে বসবাস ও প্রজননের সুবিধা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে তৈরিকৃত পাখির বাসা, কলস, ফুলদানি, পটল ফুলদানি বিদেশে রপ্তানি করা হয়।[২৯]

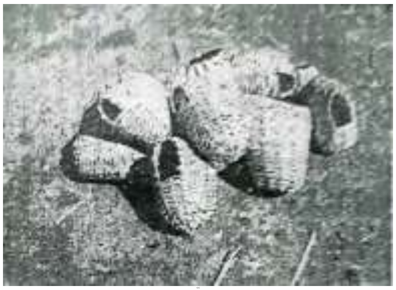

চিত্র ৯: পাখির বাসা।

দ) নারিকেল ছোবলা:

যশোর জেলায় প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মে। বাণিজ্য কেন্দ্র নওয়াপাড়াসহ প্রায় সকল হাট বাজারে নারিকেল কেনা-বেচা হয়। আড়তদাররা নারিকেল কেনার পর কুলি-মজুরদের দ্বারা ছোবলা আলাদা করে নেয়। এ ছোবলা থেকেই তৈরি হয় কাঁতা বা উন্নতমানের শক্ত দড়ি।[৩০] কাঁতা দেশের বাইরেও রপ্তানি হয়। বড় ঘর তৈরিতে কাঁতা বেশি ব্যবহৃত হয়। ধানের গোলাঘর তৈরিতে কাঁতাই প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া নারিকেলের ছোবলা দিয়ে তৈরি হয় উন্নতমানের কার্পেট, জাজিম তৈরিতেও রয়েছে ছোবলার বিশেষ কদর। ছোবলা থেকে উন্নতমানের পা-পোষ তৈরি হয়। এছাড়াও কাঁতা দিয়ে নানাপ্রকার লোকশিল্পের দ্রব্যাদি তৈরি হয়। যেমন- টুপি, আয়নার পাড় বাঁধানো, ছোট ছোট পাত্র তৈরিতে কাঁতার বিশেষে ভূমিকা রয়েছে।

ধ) মৃৎশিল্প:

বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। এ শিল্পের সাথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা অঞ্চলে পোড়ামাটির শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩১] সম্ভবত এ সময় থেকে বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাটি ও পানি একত্রে মিশিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাল বংশের লোকেরা প্রয়োজনীয় গৃহসমাগ্রী তৈরি করেন। তারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, হুক্কা, কল্কে, কলসি, খোলা, পুতুল, মূর্তি, ফুলদানী, ছাইদানী, জলকান্দা, দধির হাড়িঁ, ঢাকনা, থালা-বাসন, বদনা, পেয়ালা, বাটি, মালসা, প্রদীপ ও কুপি তৈরি করেন।[৩২] পয়সা জমানো পাত্র হিসেবে মাটির ব্যাংক অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন আকৃতিতে এ ব্যাংক তৈরি করা হয়। যেমন- মাছ, মোরগ, পাখি, তাল, আম, বেল, কুমড়া, নারিকেল প্রভৃতি। এ মাটির সামগ্রী নির্মাণকারীদেরকে কুমোর বা কুম্ভকার বলা হয়। কুমোররা বংশানিকুক্রমিকভাবে এ কাজ করে থাকেন। পেশা অনুযায়ী কুম্ভকাররা 'কুচল', 'হাম্মর' ও দেওরা-এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যারা ছোট মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন তারা কুচল, বাড় পাত্র নির্মাতারা হাম্মর এবং প্রতিমা নির্মাতারা দেওরা হিসেবে পরিচিত।[৩৩]

যশোর সদুল্যাপুর গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া শাখারীপাড়া (দেয়াপাড়া) গ্রামের নারায়ণ পাল ও গুণধর পাল এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৃৎশিল্পিরা নানা ছাঁচে তাদের শিল্পকর্ম গড়ে তোলেন। বিশেষ মৌসুমকে কেন্দ্র করে তারা হাড়ি, কলস ও সরা নান্দনিক নকশা করে হাট বাজারে উপস্থিত করেন। যেমন- লক্ষ্মীরসরা, নবান্ন বা বৈশাখ

পার্বণে রং তুলি দিয়ে সৌন্দর্যের ডালি সাজানো হয়। বাঘারপাড়া উপজেলরা দিয়াপাড়া, আন্দোলন বাড়িয়া, দোহাকুলো ও দরাজহাট গ্রামে পাল বংশের লোকেরা বসবাস করেন। তারা দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মৃৎশিল্পের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় যশোরের অভয়নগর উপজেলার পালপাড়া, পাকের গাতি, চালশিয়া প্রভৃতি গ্রামে। একসময় যশোর শহরে পালদের কর্মতৎপরতা বিদ্যমান ছিল। আজও যশোর শহরে পাল বাড়ির মোড় নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান রয়েছে। যাহোক বর্তমানে এ শিল্পিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। শিল্পিরা এ পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করছেন। ফলে মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ১০: মৃৎপাত্র।

ন) মাটির ফলক:

মৃৎশিল্পের সম্প্রসারিত রূপ হলো মাটির ফলক, এটি 'টেরাকোটা' নামে পরিচিত। পোড়ামাটির ফলক গৃহ সজ্জার উপকরণ ব্যতীত বাংলার রমণীদেও অলংকার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এই ফলক বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ইমারত তথা মন্দিও ও মসজিদে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।[৩৪] ধর্মীয় ইমারতে ব্যবহৃত ফলক বাংলার লোকজ শিল্পধারার পরিচয় বহন করে। মাটির ফলক নক্শার বিষয়বস্তু হলো- অর্ধ প্রস্ফুটিত ফুল, কিন্নর-কিন্নরী, দণ্ডায়মান গস্থামীণ মানুষ, জীব-জন্তু, রাজা-রাণী, হাতি, হরিণ, ময়ূও ইত্যাদি। ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে শিব, বিষ্ণু, গণেশ, মঞ্জুশ্রী, তারা ও ব্রহ্ম প্রধান। এয়াড়া দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-উল্লাস, ব্যথা-বেদনা এবং জীবনধারাও পোড়ামাটির ফলকে প্রতিফলিত হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় স্থাপত্যে জ্যামিতিক নকশার ফলক লক্ষ্য করা যায়।[৩৫] এসব ফলক নক্শার মধ্যে যশোর অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবন-জীবীকার অন্বেষায় যে শিল্পকর্ম বিক্রি কওে লোকজ কারু ও চারুশিল্পিরা তাদেও প্রয়োজন মিটিয়েছেন, আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তবু তারা একেবাওে থেমে যাননি। বৈশাখী মেলা, বাসন্তী মেলা, রথের মেলা ও হাট-বাজাওে এখানে যে পরিমাণ মৃৎশিল্পের দ্রব্য সামগ্রীর আগমন ঘটে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যশোরের এ শিল্পের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তবে কাঁচামালের স্বল্পতা ও মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পিরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তবুও সমকালীন চাহিদা মিটিয়ে যশোরের লোকজ কারু ও চারু শিল্পিরা তাদেও ঐতিহ্যবাহী শিল্পীকে চিরায়ত কওে তুলবেন-এঁাই প্রত্যাশা।

চিত্র ১১: মন্দিরের টেরাকোটা।

উপসংহার:

বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগরণ ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন লোকশিল্প চর্চাকে বেগবান করে। সে সময় থেকে অদ্যাবধি গ্রামের তাঁতি, কারুশিল্পী ও চারু শিল্পীরা নান্দনিক শিল্প দ্রব্য তৈরি করে আসছে। লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়, আমাদের অহংকার। তবে গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় লোকশিল্পের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় অনেকেই জীবিকার অন্বেষণে পেশা ত্যাগ করছেন। তবুও শহরের কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার ফলে শেকড়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাই দেশজ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখনো যশোরের শ্রমজীবী মানুষ, পাল-পাড়ায়, কুমোর-পাড়ায়, তাঁতি-

পাড়ায়, ঋষি-পাড়ায় তাদের সৃজনশীল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং এই লোকশিল্পের উপাদানসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলে বাঙালির দেশীয় শেকড়ের ভিত যেমন মজুবুত হবে তেমনি জাতি স্বদেশ প্রেমেও উজ্জীবিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ

[১] সুর, অতুল। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন। পুস্তক বিপনী, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ৩৫।

[২] আসাদ, আসাদুজ্জামান, সম্পাদনা। যশোর জেলার ইতিহাস, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ. ১৮।

[৩] পোদ্দার, সুস্মিতা। লোকসংস্কৃতিঃ ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১, কোলকাতা, পৃ. ৫।

[৪] ইসলাম, মাযহারুল। ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ১২।

[৫] চক্রবর্তী, বিমলেন্দু। 'বাংলার শিল্প'। ভারত বিচিত্রা, জানুয়ারি, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৬; রায়, সুরঞ্জন। 'নড়াইল জেলার লোকসংস্কৃতি ও প্রত্নসম্পদ'। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পঞ্চবিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, ২০০৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২০৭।

[৬] সৈয়দ, মাহমুদুল হক। 'গ্রামীণ চারু ও কারুকলা'। বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ২১৩।

[৭] আহমদ, তোফায়েল। লোকশিল্প। বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডশন, ১৯৮৭, সোনারগাঁও, পৃ. ৪৮-৫০; লীনা, শাহনাজ হুসনে জাহান। 'গাজীর পট: উপস্থাপনা রীতি, চিত্রাংকন শৈলী ও উৎস'। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৭, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৭।

[৮] Zaman, Niaz. The Art of Kantha Embroidary. Shilpakala Academy, 1981, Dacca, Introduction.

[৯] রায়, তাপস। 'নকশি কাঁথায় পাশ্চাত্য বিষয়'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৬, মাহমুদ, আব্দুল ওহাব, সম্পাদনা, কেপি বাগাচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ২৩৭।

[১০] Zaman, Niaz. op.cit. P. 20; হক, সৈয়দ মাহমুদুল। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২।

[১১] পারভেজ, মাসুদ। পিতা- ইকরাজ উদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম-শাখারিগাতী, রূপদিয়া, যশোর সদর, বয়স ৫৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.এ. সহকারী অধ্যাপক, আরবি, যশোর মহিলা কামিল মাদরাসা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জমান, নিজ বাস ভবন, যশোর সদর, ১০ মার্চ, ২০২৫।

[১২] খান, শামসুজ্জমান, সম্পাদনা। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর। বাংলা একাডেমী, ২০২৪, ঢাকা, পৃ. ১২২।

[১৩] পারভেজ, সাক্ষাৎকার।

[১৪] খান, শামসুজ্জামান, সম্পাদনা। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর। পৃ. ১২৩।

[১৫] প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৩।

[১৬] পারভেজ, সাক্ষাৎক্ষার; খান, সম্পাদনা। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর। পৃ. ১২৪; আহমদ। লোকশিল্প। পৃ. ৬৮-৬৯।

[১৭] প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৪।

[১৮] প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৪।

[১৯] শিল্পি আকবরের কণ্ঠে হাত পাখার গান:

"তোমার হাত পাখার বাতাসে
প্রাণ জুড়িয়ে আসে,
কিছু সময় আরো তুমি

থাকো আমার পাশে... ।”

কবি হেলাল হাফিজ (১৯৪৮-২০২৪) তাঁর ‘প্রস্থান’ কবিতায় তাল পাখার উল্লেখ করে বলেন-

“এখন তুমি কোথায় আছো কেমন আছো, পত্র দিয়ো
এক বিকেলে মেলায় কেনা খামখেয়ালী তাল পাখাটা
খুব নিশিথে তোমার হাতে কেমন আছে, পত্র দিয়ো... ।”

[২০] হক। ‘গ্রামীণ চারু ও কারুকলা’। পৃ. ২২১।
[২১] প্রাগুক্ত।
[২২] Mookerjee, Ajit Coomar. Folk Art of Bengal. Calcutta University, 1193, Calcutta, P. 25; হক। ‘গ্রামীণ চারু ও কারুকলা’। পৃ. ২২২।
[২৩] ইসলাম, শাহীনুল। পিতা- মো. ইদ্রিস আলী, গ্রাম-বালিয়াডাঙ্গা, অভয়নগর, বয়স: ৪৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম. এ, প্রভাষক, পল্লীমঙ্গল কলেজ, অভয়নগর, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী; সৈয়দ হাদিউজ্জামান, অভয়নগর, যশোর, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫; সাক্ষাৎকার, পারভেজ।
[২৪] প্রাগুক্ত।
[২৫] হক। ‘গ্রামীণ চারু ও কারুকলা’। পৃ. ২২৩।
[২৬] ইসলাম, সাক্ষাৎকার; খান, সম্পাদনা। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর। পৃ. ১২৫।
[২৭] পারভেজ, সাক্ষাৎকার; প্রাগুক্ত।
[২৮] মোহাম্মদ, মোজাম্মেল। পিতা- মো. আব্দুল্লাহ, বাহাদুরপুর, বয়স- ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম. এ, সহকারী শিক্ষক, শাহ ওয়ালীউল্যাহ দাখিল মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান, যশোর সদর, ডিসেম্বর- ৬, ২০২৪।
[২৯] খান, সম্পাদনা। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর। পৃ. ১২০।
[৩০] খায়ের, আবুল। পিতা: মো. রহমত আলী, গ্রাম: গোরপাড়া, শার্শা, বয়স ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিএ, বিএড, শার্শা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী; সৈয়দ হাদিউজ্জামান, শার্শা, চেক পোস্ট, যশোর, এপ্রিল ২৯, ২০২৫।
[৩১] চৌধুরী, শফিকুর রহমান। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ১৩।
[৩২] প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫।
[৩৩] পাল, অসিতবরণ। ‘ধামরাই এর ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প: একটি পর্যালোচনা’। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৩৭।
[৩৪] Ghosh, Sankar Prosad. Teracotta of Bengal. BR Publishing Corporafion, 1986, Delhi, 26; হক, ‘গ্রামীণ চারু ও কারুকলা’, পৃ. ২২৪।
[৩৫] Dutta, GS. ‘Bengali Teracottas’. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol.VI, 1938, Calcutta, P.169; হক। ‘গ্রামীণ চারু ও কারুকলা’। পৃ. ২২৫।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্র সূচী:

চিত্র ১: গাজির পট, Islam, Sirajul (ed.). Banglapedia. Asiatic Society of Bangladesh, 2002, Dhaka, P.19.

চিত্র ২: নকশী কাঁথা, চিত্রটি লেখক কর্তৃক যশোর সদর থেকে সংগৃহীত।

চিত্র ৩: শোওয়া কাঁথা, চিত্রটি লেখক কর্তৃক যশোর সদর থেকে সংগৃহীত।

চিত্র ৪: সোফার পিলো কভার, লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ, পৃ. ১২৩।

চিত্র ৫: নকশি ওয়াল ম্যাট, লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ, পৃ. ১২৭।

চিত্র ৬: নকশি পাখা, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ. ৫৫৭।

চিত্র ৭: বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, Islam, Sirajul (ed.). Banglapedia, Asiatic Society of Bangladesh, 2002, Dhaka, P.17.

চিত্র ৮: শোলার তৈরী বিভিন্ন ফুল, Islam, Sirajul (ed.). Banglapedia, Asiatic Society of Bangladesh, 2002, Dhaka, P.22.

চিত্র ৯: পাখির বাসা, লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ, পৃ. ১২০।

চিত্র ১০: মৃৎপাত্র, লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ, পৃ. ১১৬।

চিত্র ১১: মন্দিরের টেরাকোটা, চক্রবর্তী, রানা। ‘বাংলার মন্দিরের টেরাকোটার সমাজচিত্র’।

https://www.facebook.com/rana.chakraborty.397/posts/8592714540782413 । তারিখঃ ৮ নভেম্বর, ২০২১